প্রলয়মেঘ

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

অরণ্যমন প্রকাশনী

প্রলয়মেঘসম্ভব

শেষের শুরুর কিছু কথা

"Some say the world will end in fire,
Some say in ice."
— Robert Frost.

তিনটি বই জুড়ে এই মায়াঘেরা অভিযানে যাঁরা এতদিন অভীর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা সবাই জানেন, অগ্নি এবং হিমের দৃশ্যকল্প কীভাবে বারবার ফিরে এসেছে সমরগরিমা তথা সমগ্র মায়াজগতের নির্মাণে। আজ সেই ছেলেটির যাত্রাশেষের কাহিনির ভূমিকা লিখতে বসে আর এক প্রলয়সন্ধানী কবিতার এই লাইনদুটোই সবার আগে মনে এল। অগ্নিময় লোভ আর হিমশীতল ঘৃণার সংঘাতে প্রলয় যদি আসেই, তাহলে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় আদৌ আছে কি?

বইয়ের শেষে পাঠক এ-প্রশ্নের সদুত্তর পাবেন, এই আশা রাখতে ক্ষতি নেই। 'প্রলয়যোদ্ধা'-তে অভীর অভিযান যখন শুরু হয়েছিল, তখন এই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পাঠককে আনন্দ দেওয়া। 'প্রলয়বহ্নি'-তে গল্প যত এগিয়েছে, ততই গম্ভীরতর হয়েছে বিষয়বস্তু; সমরগরিমার উজ্জ্বল জগতের কোণে-কোণে ক্রমশ ঘনিয়েছে অন্ধকার। 'প্রলয়মেঘ'-এ অবশেষে আসতে চলেছে বহুজন-ভয়োদ্রেককারী অনিবার্য প্রলয়, যার পূর্বাভাস দেওয়া ছিল অভীর বিগত দু'টি কাহিনিতেই। তাই এই বইতে অন্ধকার হয়েছে গাঢ়তর, বেড়েছে ছায়াদের দৈর্ঘ্য। ছায়া বনাম আলোর এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কার জয় হল, সেই বিচারের ভার সুধী পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তা-ও একটি কথা না বললেই নয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমবার প্রলয়যোদ্ধার গল্প বলতে আরম্ভ করেছিলাম, আজ তার যাত্রাপথ শেষ হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু একই রয়ে গেছে— পাঠককে অনাবিল আনন্দ দেওয়া। সেই কল্প-আনন্দের সন্ধান যদি অভীর কাহিনিতে আপনি পেয়ে থাকেন, তাহলেই আমার সব পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

লেখকের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগে একটি ছোটো স্বীকারোক্তি এখানে করে রাখি। এই বইতে শিবের অস্ত্র পাশুপত নিয়ে বেশ কিছু কথা রয়েছে। পাশুপত শিবের অধিকারে থাকা এক চরম ধ্বংসাস্ত্র— পুরাণে এবং মহাকাব্যে উল্লিখিত পাশুপতের সঙ্গে এই বইয়ের পাশুপতের মিল এইটুকুই। অভীর গল্পের মধ্যে পাশুপতকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেই ব্যাখ্যাটি একান্তই আমার মস্তিষ্কপ্রসূত; মহাকাব্যের বিধ্বংসী অস্ত্রটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য অতি সামান্য। লেখকের এই কল্পনাবিলাসে যদি কোনো শাস্ত্রবেত্তা অসন্তুষ্ট হন, আগেই তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে রাখলাম।

অগ্রজপ্রতিম লেখক মাননীয় ঋজু গাঙ্গুলী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানালাম তাঁর অসামান্য ভূমিকাটির জন্য। শুধু তা-ই নয়, অভীর এই কাহিনি তাঁর ভরসাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল; তাই একান্ত প্রিয় এই 'হিরো'জ জার্নি'র শেষের গানে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলাম। আর অরণ্যমনের কর্ণধার মাননীয় চিরঞ্জীৎ দাসের কথাও না বললেই নয়। তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে অভীর গল্প এত পাঠকের কাছে পৌঁছত না কোনোদিনই। 'প্রলয়যোদ্ধা' সিরিজের নেপথ্যে থাকা এই দুই সমরোত্তমকে অন্তর থেকে আমার নমস্কার জানালাম।

এর পরেও আর একজনকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো বাকি থেকে গেল।

সে ব্যক্তি আপনি, হে পাঠক। আপনার ভালো লাগবে— এই আশায় একদিন বলতে শুরু করেছিলাম স্বর্ণখেচরের সন্ধানে বেরনো এক অতি সাধারণ ছেলের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প। সেই ছেলেটাকে যে অকুণ্ঠ ভালোবাসা এতদিন আপনি দিয়েছেন, তার পাশে থেকেছেন প্রতিটি আনন্দ-বিষাদে, তার জন্য এই লেখকের ঋণ রইল আপনার কাছে। এ-লেখা তো আপনারই জন্য লিখেছিলাম আমি। প্রলয়কালে যখন অগ্নি আর হিম মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে অন্তিম যুদ্ধে, তখন আপনারই চোখের বিস্ময়মাখানো দৃষ্টি কল্পনা করে আমি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেছি। আপনি না থাকলে কে চিনত সমরগরিমাকে? এই লেখা আপনারই দান, পাঠক— সোনার পাখির দিব্যি!

আনন্দময় হোক আপনার আগামী; অটুট থাকুক জীবনপথের সমরগরিমা।

শান্তি, শান্তি, শান্তি।

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়
অগাস্ট, ২০২৩

।। প্রথম অধ্যায় ।।

বিচারসভা

দুঃস্বপ্ন দেখছিল অভী।

সে শুয়ে ছিল বিরাট পালঙ্কের ওপর, পালকের মতো নরম বিছানায়; তার ওপর পাতা আছে সূক্ষ্ম মখমলের তৈরি লালরঙের চাদর। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় শুতেই আরামে তার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘুমটা মোটেই ভালো হচ্ছিল না।

স্বপ্নে লীনাকে দেখছিল সে। লীনা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে; তার বুকে বিরাট একটা ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে তার পোশাক ভিজিয়ে দিয়েছে। আর তার চোখেমুখে কী তীব্র কষ্টের ছাপ! লীনা কাঁদছে; বলছে, "অভী! যা হোক কিছু করো! এই যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারছি না।"

অভী ছটফট করে উঠল ঘুমের মধ্যে। "কী করব, বলে দাও তুমি। আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয় আমি করব। কী করলে তোমার যন্ত্রণা কমবে, বলো আমাকে!"

"আমি নিজেই জানি না কী করে কমবে। তুমি কিছু উপায় করো।"

"তুমি কি বেঁচে আছ? লীনা, উত্তর দাও! তুমি কি জীবিত? কোথায় আছ তুমি?"

"একে কি 'বেঁচে থাকা' বলা যায়? জানি না। কিচ্ছু জানি না আমি; শুধু এইটুকু জানি, আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। আর আমি পারছি না। অভী! অভী!"

"বলো! বলো!"

"আমি যদি কোনোদিন ফিরে আসি, তুমি কি আগের মতো আমার বন্ধু হবে? আমাকে ভালোবাসবে?"

অভী দেখতে পেল, লীনার দেহ থেকে ধোঁয়া উঠছে— দেহটা যেন প্রচণ্ড গরম কোনো ধাতুর তৈরি। সে বলল, "তা নিয়ে সন্দেহ আছে তোমার? কিন্তু তুমি কোথায়? তুমি কি ফিরে আসতে পারবে?"

লীনা তাকিয়ে রইল তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে। তার চোখে জল টলটল করছে। হাতদুটো শক্ত করে মুঠো করে রেখেছে সে। ফিসফিস করে সে বলে উঠল, "অভী, আমি যদি কোনোদিন ফিরে আসি, তুমি কি আমাকে মরে যেতে বলবে?"

ঘুমের মধ্যে আবার ছটফটিয়ে উঠল অভী। এ-সব কী কথা বলছে লীনা? গোঙাতে লাগল সে নিজের অজান্তেই। লীনার অবয়ব পিছিয়ে যাচ্ছে, একটা কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলছে তাকে। সে শুনতে পাচ্ছে লীনা বলছে, "আমার ফিরে না আসাই ভালো। আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না, অভী।"

পুড়ে যাচ্ছে লীনার দেহটা, তপ্ত তামার মতো রং ধারণ করেছে তার চামড়া, হু-হু হাওয়ায় উড়ছে তার চুল, ছাই উড়ছে চতুর্দিকে, দৃশ্যটা কাঁপছে তীব্র তাপে। অভী একটা চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল স্বপ্নের ঘোরটা কাটতে। চারপাশ ভরে আছে অস্পষ্ট অন্ধকারে। তারপর সে বুঝতে পারল, সে বসে আছে রক্ষোপুরীর অতিথিশালার বিছানার ওপর। একটু দূরের জানালা দিয়ে বাইরের মশালের আলোর হালকা আভা আসছে। জানালার একপাশে সরানো পরদা দুলছে মৃদু হাওয়ায়। তার হাত চলে গেল বালিশের নিচে। স্বপ্ন-উপলটা ঠেকল হাতে।

এ ভয়ানক জিনিস মাথার নিচে নিয়ে শোয়া তার উচিত হয়নি। স্বপ্ন-উপল এই ধরনের অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখায়, সে জানে। তবু যদি ভবিষ্যতের কোনো দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, এই আশায় সে ওটাকে মাথার তলায় নিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল। কাজটা অন্যায় হয়েছে। অধিনায়ক বজ্রধর জানতে পারলে বকাবকি করবেন।

গলা শুকিয়ে গেছে দুঃস্বপ্ন দেখে। উঠে গিয়ে স্ফটিকনির্মিত জলপাত্র থেকে আকণ্ঠ জল পান করল অভী।

পাশের কক্ষে আছেন বজ্রধর আর মেঘবর্ণ। সৌজন্যের বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য ওঁদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন রাক্ষসরাজ পুনর্বসু।

সমরগরিমার নিয়ামক বিনীতেশকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে; তবে তাঁকে আলাদা করে অন্যত্র রাখা হয়েছে কড়া প্রহরার মধ্যে। সৌজন্যের মতো কারাকক্ষে তাঁর ঠাঁই হয়নি ঠিকই, তবে বিগত রাক্ষস-মানুষ যুদ্ধ বাধানোর পেছনে তাঁরও যে একটা বড়ো ভূমিকা ছিল, সেটা কেউ ভোলেনি। আপাতত অধিনায়ক

বজ্রধরের ব্যবস্থাপনায় তাঁকে জটায়ুবাহনে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। কাল সৌজন্য আর বিনীতেশ— দু'জনেরই বক্তব্য সর্বসমক্ষে শোনা হবে। রাজা পুনর্বসু বিনা বাক্যব্যয়ে দু'জনেরই শিরশ্ছেদ চাইছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে তিনি ওদের কথা শুনতে রাজি হয়েছেন।

কাল সকালে রাজা ও অন্যান্য বিমোহক ও পত্রতিলক অভিজাত রাক্ষসদের সামনে বসবে বিচারসভা। সমরগরিমার পক্ষ থেকে অভীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অধিনায়ক বজ্রধর আর সমরোত্তম মেঘবর্ণ।

আর একজনও অবশ্য এসেছেন সমরগরিমা থেকে, তবে বিচারসভায় তিনি অংশ নেবেন না, বলেই দিয়েছেন। তিনি রক্ষোবৈদ্য। রাজকন্যা ঊর্মির অব্যবহৃত কক্ষটি আপাতত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

অভী আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল, কিন্তু আর তার চোখে ঘুম এল না। লীনার সেই কষ্টে ভরা মুখটা বারবার ভেসে উঠতে লাগল তার চোখের সামনে।

ধীরে-ধীরে জানালার বাইরে আকাশ ফরসা হয়ে এল। রাজপুরী মুখরিত হয়ে উঠল পরিচারক-পরিচারিকাদের কলরবে। অভী উঠে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে।

শরীরটাতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে তার। এই অতিথিশালাতেই গতবার এসে থাকতে হয়েছিল তাকে। সে-বার রাজকন্যা ঊর্মি স্বয়ং তার তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তিনি না থাকাতে মাল্যপর্বতের রক্ষোপুরী বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে তার।

ঊর্মির কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল অভীর। এই শত্রুপুরীতে অমন অকৃত্রিম বন্ধু তার আর কেউ ছিল না। দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে সেই জীবন্ত আঁধারের সামনে তাঁর শেষ মুহূর্ত মনে পড়তেই একবার শিউরে উঠল সে।

না, আর বেশিক্ষণ একলা থাকা যাবে না। এই জায়গাটার সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। একা থাকলেই সেগুলো এসে ঘিরে ধরছে তাকে। শৌচালয়ে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিয়ে অভী অতিথিশালায় তার কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এল।

একজন বর্শাধারী মধ্যবয়স্ক রাক্ষস প্রহরী পাহারায় ছিল বাইরে। কাল আলাপ হয়েছে লোকটার সঙ্গে। অভী বলল, "বীরেশ, আমাদের সমরোত্তমরা কি ঘুম থেকে উঠেছেন?"

বীরেশ নামে প্রহরী মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ, প্রলয়যোদ্ধা। পূর্বদিকের কক্ষে ওঁরা আছেন। আমাদের সেনানায়িকা গেছেন ওঁদের কাছে। আপনিও চাইলে ওঁদের সঙ্গে যোগদান করতে পারেন। এই যে, এইদিকে।"

তার দেখিয়ে দেওয়া কক্ষটির দরজায় টোকা দিল অভী। দরজা খুলে তাকে দেখে মেঘবর্ণ একগাল হাসল। "কী, ঘুম ভাঙল?"

অভীও হাসল। "বেশ কিছুক্ষণ ভেঙেছে। ভেতরে আসব?"

"এসো, এসো। এঁদের সেনানায়িকা প্রজ্ঞা এসেছেন। আজকের বিচারসভার আগে তাঁর সঙ্গেই একটু প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিচ্ছি আমরা।"

মেঘবর্ণ দরজার সামনে থেকে সরে গেল, অভী এসে ভেতরে ঢুকল।

অধিনায়ক বজ্রধর ও প্রজ্ঞাকে দেখে নমস্কার জানাল সে। তাঁরাও প্রতিনমস্কার করলেন। বজ্রধর বললেন, "অভী, ভালোই হয়েছে তুমি এসে পড়েছ। রাক্ষস-সেনানায়িকা এখুনি তোমার কথাই বলছিলেন।"

অভী কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। প্রজ্ঞা বললেন, "অভী, আমি মরুময় প্রসঙ্গে রাজাকে তোমার কথা বলছিলাম। গতবার সমরগরিমার সঙ্গে মাল্যপর্বত যে অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, তার পেছনে সৌজন্য বা তোমাদের নিয়ামক বিনীতেশ যেমন দায়ী, তেমনই আমাদের মহামন্ত্রী মরুময়ের ভূমিকাও নিতান্ত কম ছিল না। সৌজন্যের বদ মতলব সব জানা সত্ত্বেও তিনি স্রেফ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে গেছেন। পরোক্ষভাবে রাজকন্যা ঊর্মির মৃত্যুর জন্য তিনিও দায় এড়াতে পারেন না। তাঁর সাহায্য না পেলে সৌজন্যের এতটা বাড়বাড়ন্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।"

অভী মাথা নাড়ল। কথাগুলো প্রজ্ঞা ঠিকই বলেছেন। তার হঠাৎ মনে হল, "আচ্ছা, সুতসোমের মৃত্যুশোক কি উনি এতদিনে ভুলতে পেরেছেন?"

সেই প্রসঙ্গ তোলা একান্তই অনুচিত, সে জানে। সে শুধু বলল, "কিন্তু মরুময় ঐশিকমায়ার অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মহারাজ পুনর্বসু পারবেন তো?"

বজ্রধর বললেন, "এই প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল আমাদের। তোমার এই আশঙ্কা সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে, অভী।"

প্রজ্ঞা বললেন, "দেখুন, আমি রাজা পুনর্বসুর মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাইনি কোনোদিন। তাঁকে আমি অনেকবার বলেছি, সমরগরিমার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে অভীকে অনুরোধ করলে সে তাঁকে দেশের মেঘের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দিতে পারে। অভী যে মেঘনিয়ন্ত্রণ-মায়ার প্রয়োগ করতে পারে, তা তো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। ওই মেঘনির্মাণশালার মেঘগুলোকে নিজের মুঠোয় এনেছে বলেই তো মরুময়ের এত ক্ষমতা! ও একটা অতি দুষ্ট লোক; কেউ ওকে পছন্দ করে না। আমি রাজাকে গতকালই বলছিলাম, 'আপনার কী মনে হয়, কেন মেঘনির্মাণশালার প্রহরীরা অভীকে সাহায্য করেছিল?' পুরোটাই ওরা করেছিল মরুময়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। ওই লোকটা এ-দেশের পক্ষে একটা অভিশাপ, ওকে ত্যাগ করাতেই আমাদের সবার কল্যাণ। মৃত্যুদণ্ড যদি ওকে দিতে না-ও পারা যায়, রাজ্য থেকে তো বিতাড়িত করাই যায়।"

মেঘবর্ণ এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে অভীর পাশের কাষ্ঠাসনে বসে বলল, "রাজা যদি তা করতে পারেন, তিনি যদি অভীর সাহায্যে সাধারণ রাক্ষসদের কাছে জলের উৎস খুলে দিতে পারেন, তাহলে দেশবাসী তাঁকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।"

অধিনায়ক বজ্রধর মৃদু হাসলেন। "মেঘবর্ণ, রাজা পুনর্বসুকে আমি দীর্ঘদিন চিনি। মাননীয়া সেনানায়িকা, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে, গর্বিত রাজা আমাদের সাহায্য নিতে রাজি হবেন না। আপনাদের রাক্ষসদের কাছে অভী-সহ আমরা সবাই শত্রুদেশের লোক। এতখানি গুরুত্বপূর্ণ

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

ব্যর্থ হৃদয়

সমরগরিমায় ফেরার পর সমরোত্তমরা সম্মেলন কক্ষে গেলেন, কিন্তু অভী চলল নিধির সঙ্গে দেখা করতে। মাল্যপর্বতের কাহিনি, সৌজন্যের ইতিহাস— সব তাকে না বলা পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না।

মিত্রভবনে পাওয়া গেল নিধিকে; নিজের কক্ষে বসে তরবারিতে শান দিচ্ছিল সে। অভীকে দেখে তরবারি পাশে নামিয়ে একটু হেসে বলল, "বোসো, বোসো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, গুরুতর সংবাদ আছে।"

তার পাশে বসে অভী তাকে অল্প কথায় মাল্যপর্বতের গল্প শুনিয়ে দিল। সৌজন্যের কথা শুনে নিধি বলল, "কেন জানি না, আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ওকে রাজা মৃত্যুদণ্ড দেবেন না শেষ পর্যন্ত। দেখো, সেটাই কেমন সত্যি হয়ে গেল।"

অভী নিধির বাড়ির কথা ভাবছিল। গত যুদ্ধের শেষে নীরসেনার জীবন কাটিয়ে ফিরে আসার পর থেকেই তার বাবার সঙ্গে নিধি আর কথা বলে না। বৃদ্ধ দিঙ্‌নাগ এ নিয়ে কী ভাবেন, অভী জানে না, কিন্তু নিধি যে তার বাবার ব্যবহারে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ, সে-কথা অভী খুব ভালো করেই জানে।

সে বলল, "তোমার বাড়ির খবর কী?"

নিধি চোখ সরু করে তাকাল। "বাড়ির খবর বলতে যদি বাবার কথা জানতে চাও, তাহলে আমি জানি না। আমি তার সঙ্গে কথাও বলি না, বাড়ি গেলে দেখাও করি না। মা মোটামুটি আছে। সবচেয়ে খারাপ ছিল নীপা, যদিও এখন ধীরে-ধীরে শোক সামলে উঠছে। তরুণের মৃত্যুর পর থেকে একেবারে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল বেচারি, তা-ও ইদানীং মাঝেমধ্যে আয়তনে আসছে। আমি ওকে বলেছি, 'বেশি বেশি আয়তনে আসবি; এখানকার পরিবেশ আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো।' ওর-ও বাড়িতে মন টেকে না, বুঝতে পারি আমি। তুমি ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বোলো তো। অভীদাদাটিকে ও খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তোমার সান্ত্বনা পেলে হয়তো ওর মনটা একটু ভালো হবে।"

অভী বলল, "বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু আয়তনে ও..."

তাকে শেষ করতে না দিয়ে নিধি বলল, "আমি ওকে এখানে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করা শেখাই। আর সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলাম; তিনি ওকে বেশ কিছু ছোটোখাটো মায়াপ্রয়োগ শেখাচ্ছেন। নিজের দুঃখগুলো যতটা ওকে ভুলিয়ে রাখা যায়, এই আর কী! ওর হাতে নিয়তিলাঞ্ছন স্পষ্ট হয়ে উঠছে ইতোমধ্যেই। সমরোত্তম শ্যামশ্রী আমাকে বলেছেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ওকে এখানে নিয়ে আসবেন। তখন যদি বাবা আপত্তি করে, আমার সঙ্গে জোর ঝগড়া বেধে যাবে তার।"

কক্ষের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অভী। লীনার শয্যা শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু একদম গোছানো, পরিষ্কার শয্যা। দেয়ালে তার ধনুকটা আগের মতোই ঝুলছে; পাশে রাখা আছে তিরপূর্ণ তূণ। নিধির কাজ এ-সব। টানটান করে চাদর পাতা বিছানাটা দেখলে মনে হচ্ছে, লীনা বাইরে কোথাও গেছে, একটু পরেই ফিরে এসে বসবে এখানে।

অভীর মন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, "আচ্ছা, লতাকাকিমার ওখানে গিয়েছিলে নাকি আর?"

নিধির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। "হুঁ। গতকালই গিয়েছিলাম। কাকিমা যেন অনেক বদলে গেছেন। আমি দেখা করতে গেলাম, কিন্তু উনি আমাকে আর ঘরে ঢুকতেও বললেন না, দরজা থেকেই শুকনো মুখে দু'-চারটে হুঁ-হাঁ করে বিদায় করে দিলেন। জানো, দেখে মনে হল, উনি যেন সবসময় খুব ভয়ে ভয়ে আছেন। কীসের এত ভয়, জানি না।"

অভী ভাবতে লাগল। লীনার মা সবসময় ওদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। নিধিকে তো তিনি নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। হঠাৎ হল কী তাঁর?

নিধি বলল, "অভী, আর একটা কথা।"

"কী?"

"কাল যখন লতাকাকিমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, আমার হঠাৎ কেমন গা-ছমছম করে উঠল। মনে হল যেন এই বাড়ির ভেতরে বা আশেপাশে এমন কিছু একটা আছে, যেটাকে ঠিক বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না।"

বেশ অবাক হল অভী। দুনিয়ায় কোনোকিছুতে আজ পর্যন্ত সে নিধিকে ভয় পেতে দেখেনি। সে কৌতূহলী হয়ে বলল, "ভৌতিক কিছু দেখেছ নাকি?"

নিধি মাথা নাড়ল। "না, ব্যাপারটা ঠিক ভৌতিক নয়। এবং কিছু দেখিওনি। তবে ওই যে বললাম, একটা গা-ছমছমে অনুভূতি হল। কেন ও-রকম হল, আমি বলতে পারব না; অন্তত আমার কাছে ব্যাখ্যাযোগ্য কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, লতাকাকিমা ছাড়াও যেন আর কে একজন আমার কথা শুনছে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

অভী হাসল। "ও-রকম মাঝেমধ্যে হয়। ও তোমার মনের ভুল হবে।"

নিধিও হাসল। "তা-ই হবে! ভূতপ্রেত জাতীয় জিনিস মাল্যপর্বতে কেউ-কেউ দেখেছে, শুনেছি। ওদের ওখানে নাকি ভূত ডেকে এনে তার সঙ্গে কথাও বলিয়ে দিতে পারে কোনো-কোনো মায়াধর রাক্ষস। তবে আমাদের সমরগরিমায় ভূত-টুতের দেখা কোনোদিন কেউ পেয়েছে বলে শুনিনি।"

কক্ষের দরজা থেকে মিত্রমাসি ডাকলেন, "নিধি, অভী। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে সমরোত্তম মেঘবর্ণ এসেছেন।"

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করল। প্রত্যভিবাদন করে মেঘবর্ণ বলল, "নিধি, তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম। ত্রিশূল নিয়ে অভ্যাস করা চলছে?"

নিধি বলল, "ত্রিশূল নিয়ে খুব একটা অভ্যাস না করেও আমি ওটাকে বেশ ভালোই আয়ত্ত করে ফেলেছি। সেই ত্রিশূলধর মায়া আর নীরসেনা জীবনের প্রভাব হবে নিশ্চয়ই।"

মেঘবর্ণ বসল শয্যার পাশে রাখা কাষ্ঠাসনে। বলল, "ত্রিশূলধর মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এক আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার আগে এ জিনিস আর কারও সঙ্গে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যাক, যে কথা বলতে এলাম। কাল তোমাদের জনা সাতেক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে মায়াবিদ্যার অনুশীলন করাবেন সমরোত্তম শ্যামশ্রী। সেই খবর দিতেই এলাম। অধিনায়ক বজ্রধরের আদেশ, বাইরের রাজনীতি যা-ই চলুক, আয়তনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান যেন ব্যাহত না হয়। শ্যামশ্রী কাল ভ্রমমায়া শেখাবেন তোমাদের। খুব কাজের মায়াবিদ্যা; ভালো করে শিখে রাখলে জীবনে অনেক কাজে লাগবে।"

নিধি একটু ইতস্তত করে বলল, "মেঘবর্ণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মেঘবর্ণ সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে ফেলল নিধি কী কথা জানতে চায়। ম্লান হেসে সে বলল, "থাক না, নিধি, আর ওই প্রসঙ্গ না-ই বা তুললে!"

নিধি লজ্জিত মুখে চুপ করে গেল। মেঘবর্ণ বলল, "আচ্ছা, জানতে চাইছ যখন, বলছি। লতার সঙ্গে আমি এখন কিছুদিন হল আর দেখা করছি না। আমাকে দেখলে ওর অশান্তি বাড়ছে বই কমছে না।"

অভী একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, "লীনার জন্য ওঁর এই পরিবর্তন?"

মেঘবর্ণ বলল, "আর কী জন্য বলো? সে আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছে, 'তোমাকে দেখলে আমার খুব অভিমান হয়। মহাবীর মেঘবর্ণ, যাকে নাকি শর্বরও ভয় পেত, সে থাকতে আমার মেয়েটাকে বেঘোরে মরতে হল! তুমি এখন কিছুদিন আমার কাছে এসো না; আমি তোমাকে দেখলে অকারণেই হয়তো কটুকথা বলে ফেলব, মনে আঘাত দিয়ে ফেলব; আমি তা চাই না।' এর পর আর কোন মুখে যাব বলো ওর কাছে? নীল আর শ্যামশ্রী আমাকে বলছিল, মানবমন্দিরে আবার গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে, পাশে থাকতে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান করে দূরেই থাকতে চাই।"

অভী আর নিধি চুপ করে রইল। অভীর মনে পড়ছিল তার স্বপ্নে দেখা লীনার বলা কথাগুলো। তার মনে হল, বিষয়টা একবার মেঘবর্ণের সঙ্গে আলোচনা করলে হয়।

সে বলল, "মেঘবর্ণ, মাল্যপর্বতে থাকাকালীন আমি লীনাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।"

মেঘবর্ণ বলল, "সেটা কি নিতান্তই স্বাভাবিক নয়? ও তোমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল, তা-ই না?"

অভী বলল, "না, মানে, সেদিন আমি বালিশের তলায় স্বপ্ন-উপল নিয়ে শুয়েছিলাম।"

এইবার মেঘবর্ণের মুখের ভাব বদলে গেল। "তা-ই নাকি? কী কী দেখেছ, খুলে বলো দেখি।"

অভী তার স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্তারিত বলে গেল; মেঘবর্ণ আর নিধি হাঁ করে শুনল। নিধি বলল, "লীনা বলছে, ও বেঁচে আছে?"

অভী বলল, "সে-কথা ও নিজেই জানে না। ও কেবল এইটুকু বলল, ওর সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা করছে। আর জানতে চাইল ও ফিরে এলে আমি ওকে মরে যেতে বলব কি না। এইসব মাথামুন্ডুহীন কথার মানে কী, আমি জানি না।"

মেঘবর্ণ বলল, "অভী, স্বপ্ন-উপল যে সবসময় সবকিছু সত্যি দেখায়, তা কিন্তু নয়। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে একসঙ্গে মিশিয়ে যে দৃশ্য ওই পাথরগুলো আমাদের স্বপ্নে তুলে ধরতে পারে, সেগুলো সবসময় সত্যি না-ও হতে পারে। তুমি আর ও জিনিস মাথার কাছে নিয়ে ঘুমিয়ো না। ঘুমের মধ্যে বেশি স্বপ্ন-উপলের ব্যবহার করলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে।"

একটু থেমে মেঘবর্ণ আবার বলল, "একবার অধিনায়ক বজ্রধরকে তোমার স্বপ্নের কথা বলে দেখতে পারো, অভী। বিচিত্র ধরনের নানা মায়াবিদ্যার ব্যাপারে খুবই দক্ষ মানুষ উনি; হয়তো এর কোনো ব্যাখ্যা করে দিতেও পারেন।"

নিধি অভীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখনই একবার যাবে ওঁর কাছে?"

মেঘবর্ণ বলল, "চলো। দেরি করে লাভ কী?"

তিনজনে মিত্রভবন থেকে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে চলল আয়তনের দিকে। যেতে যেতে মেঘবর্ণ বলল, "উনি ফিরে আসায় রাক্ষসরা ভেতরে-ভেতরে কিছুটা দমে গেছে। যতই হোক, প্রতিপক্ষ হিসাবে বজ্রধরের নাম শুনলে একটু হলেও কেঁপে ওঠে না, এত বড়ো যোদ্ধা সারা মায়াজগতে নেই।"